International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 180-185
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.210

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ ও দুঃখমুক্তির উপায়: একটি সমীক্ষা

ড. মৈত্রী গোস্বামী
গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, ভারত

Received: 14.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Indian philosophical tradition, the teachings of Gautama Buddha establish suffering (dukkha) as the central problem of human life. According to Buddhist thought, suffering is not a sudden or temporary experience; rather, it is an inherent feature of human existence. The multifaceted nature of suffering is expressed in human life through experiences such as birth, aging, illness, death, and separation from loved ones. However, the distinctive feature of Buddhist philosophy is that it does not remain limited to the mere recognition of suffering; instead, it analyzes the causes of suffering and presents a clear path toward liberation from it. These teachings are clearly reflected in the Buddhist text Dhammapada, where the ethical and spiritual guidance of Buddha is presented through brief yet profound verses. This study raises two central research questions: how the Dhammapada explains the nature and causes of suffering, and how it presents the path to liberation from suffering and spiritual development. Through a brief analytical approach, this paper attempts to examine the possibilities of moral and spiritual upliftment of human life in the light of the teachings of the Dhammapada.

Keywords: Suffering, Liberation from suffering, The Four Noble Truths, The Eightfold Path, Enlightenment

ভারতীয় দর্শন চর্চার সূত্রপাত জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে। 'আমি কে?'- এই জিজ্ঞাসা থেকে যাত্রাপথ শুরু করে সুখ কী? দুঃখ কী? সুখ ও দুঃখ এর প্রভেদ কী? এই প্রভেদ কি আদৌ বর্তমান? দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? ইত্যাদি জীবন কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর অনুসন্ধান দার্শনিক মনকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে। এই জিজ্ঞাসাগুলি ভারতীয় দর্শনচর্চার রসদ জুগিয়েছে। যার ফলশ্রুতি হল বহুরূপী ও বহুমুখী ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতি। এই বহুমুখী চর্চার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানব জীবনের দুঃখ ও তার নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ। এই আলোচনায় বৌদ্ধ দর্শনের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধটি বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে জীবনের জিজ্ঞাসাকেন্দ্রিক। ভারতীয় দর্শনে দুঃখ বিষয়ক যে আলোচনাগুলি পরিলক্ষিত হয় গৌতম বুদ্ধের স্থান সেখানে সর্বাগ্রে। দুঃখ কী, কীভাবে দুঃখের মুক্তি সম্ভব— জীবনজিজ্ঞাসা এই জটিল প্রশ্নগুলিকে তিনি খুবই গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে রাজ্যপাট ত্যাগ করে নিজেকে সাধারণের ভীড়ে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর সেই তপস্যালব্ধ উপলব্ধি— জগত দুঃখময়। তাঁর এই উপলব্ধি তাঁকে সাধারণ করে তোলে। কারণ, এটি অনিবার্য সত্য যে দুঃখ প্রতিকূলরূপে সর্বজন অনুভূত বিষয়। তবে গৌতম বুদ্ধ দুঃখকে স্বীকৃতি দিয়ে থেমে থাকেন নি। এখানেই তাঁর অসাধারণত্ব। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের তিনি যে উপায় নির্দেশ দিয়েছেন তা যেমন যুক্তিনির্ভর তেমন ব্যবহারিক। আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধে *ধম্মপদের* আলোকে দুঃখ ও দুঃখমুক্তি উপায়গুলি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ধম্মপদ গ্রন্থটি গৌতম বুদ্ধের লেখা কিনা এবিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও উক্ত গ্রন্থটিতে গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শ খুবই সহজ এবং গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় সুখের উপস্থিতি থাকলেও দুঃখ একটি অনিবার্য সত্য। মানব অস্তিত্বের গভীরে দুঃখ এক সার্বজনীন উপলব্ধ বিষয়রূপে বিরাজমান। এই উপলব্ধিই বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। বৌদ্ধ দর্শনে 'দুঃখ' কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নয়; বরং এটি মানব অস্তিত্বের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, প্রিয়বিচ্ছেদ এবং অপ্রিয়সংযোগ— এসবের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে দুঃখের বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি কেবল দুঃখের স্বীকৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করে এবং সেই দুঃখ থেকে মুক্তির একটি সুসংবদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ করে। এই দুঃখ বিষয়ক মতবাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে *ধম্মপদ* গ্রন্থে।

ধম্মপদ মূলত নৈতিক উপদেশ ও দার্শনিক বাণীর এক সংকলন, যেখানে গৌতম বুদ্ধের জীবনমুখী শিক্ষাগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির সূচনাতেই বলা হয়েছে মনই সকল ধর্ম বা অবস্থার পূর্বগামী। এই উক্তি দুঃখের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। দূষিত মন নিয়ে যদি মানুষ বাক্য উচ্চারণ করে বা কর্ম সম্পাদন করে, তবে দুঃখ তাকে অবশ্যম্ভাবীভাবে অনুসরণ করে; আবার শুদ্ধ মন থেকে উদ্ভূত কর্ম সুখের দিকে পরিচালিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট হয় যে বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের মূল উৎস বহির্জগতের ঘটনাবলি নয়, বরং মানবমনের অন্তর্গত আসক্তি, তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা। একারণেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখে পরিপূর্ণ। মানুষের এই দুঃখের প্রকৃতি, তার কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ এমন এক বাস্তব ও ব্যবহারিক পথ নির্দেশ করেছেন যা মানব জীবনকে উত্তরণ পথে নিয়ে যায়।

বৌদ্ধ দর্শনচর্চার মূলভিত্তি চারটি আর্যসত্য। এই চারটি আর্যসত্য হল দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধমার্গ। প্রথম উপলব্ধ আর্যসত্যটি হল "সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্"। দুঃখ কী— এবিষয়ে গৌতম বুদ্ধ আট প্রকার দুঃখের উল্লেখ করেছেন।[১] সেই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করেও জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু, এছাড়াও প্রিয় বস্তু থেকে বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সংযোগ এবং আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভে ব্যর্থতা প্রভৃতি মানব জীবনে দুঃখের অন্তর্গত তা সহজেই বোদ্ধব্য। *ধম্মপদ* গ্রন্থে বলা হয়েছে জন্মগ্রহণ করাই হল দুঃখ। এপ্রসঙ্গে জরাবগ্গে বলা হয়েছে, "দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং"[২] অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। জন্মগ্রহণের ফলে মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এইভাবে মানবজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যেই দুঃখের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ধম্মপদের বিভিন্ন শ্লোকসমূহে এই দুঃখের বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,

"মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং।"[৩]

এই শ্লোকের অর্থ হলো মন সকল কর্মের অগ্রগামী এবং মনই সকল কর্মের মূল। যদি কেউ দূষিত মন নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, তবে দুঃখ তাকে অনুসরণ করে। এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে মানুষের মানসিক প্রবৃত্তিই তার দুঃখের অন্যতম প্রধান কারণ।

দুঃখের কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের কার্যকারণ তত্ত্বটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৌদ্ধ দর্শনের কার্য কারণ তত্ত্বটি প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'প্রতীত্য' শব্দটির অর্থ হল প্রাপ্ত হওয়া এবং

'সমুৎপাদ' শব্দটির অর্থ উৎপত্তি। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুযায়ী জগতের কোনো কিছু কারণহীনভাবে উৎপত্তি বা সৃষ্টি হতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আর্যসত্যটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় দুঃখের কারণ আছে। *ধম্মপদ* গ্রন্থে দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কামতো জায়তে সোকো কামতো জায়তে ভয়ং"[৪] অর্থাৎ কাম থেকেই শোক এবং ভয়ের উৎপত্তি। গৌতম বুদ্ধ বিশেষভাবে তৃষ্ণা বা আসক্তিকে দুঃখের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি পিয়বগ্গো এর অষ্টম শ্লোকে বলেছেন, "তণ্হায় জায়তে সোকো তণ্হায় জায়তে ভয়ং"[৫] অর্থাৎ তৃষ্ণা থেকেই শোকের উৎপত্তি, তৃষ্ণায় ভয়ের কারণ। মানুষ বিভিন্ন বস্তু, সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতার প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তির কারণে ক্রমাগত দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই আসক্তি মানুষকে সংসারের চক্রে আবদ্ধ করে এবং তাকে পুনঃপুন জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে নিক্ষেপ করে। *ধম্মপদ গ্রন্থে* আরো বলা হয়েছে, অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ মানুষের জীবনে দুঃখের সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে ধম্মপদের পিয়বগ্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথায় বলা হয়েছে— "মা পিয়েহি সমাগচ্ছি, আপ্পিয়েহি কুদাচনং; পিয়ানং অদস্সনং দুক্খং, আপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং। তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ, পিয়াপায়োহি পাপকো; গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি, যেসং নত্থি পিয়াপ্পিয়ং।"[৬] এর অর্থ হলো— প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কোনো বস্তুর প্রতিই অতিরিক্ত আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ প্রিয় বস্তুর অদর্শন যেমন দুঃখের কারণ, তেমনি অপ্রিয় বস্তুর দর্শনও সমানভাবে দুঃখদায়ক। সুতরাং প্রিয় বস্তুতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ প্রিয়ের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং তা দুঃখের জন্ম দেয়। যার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই, তার জন্য কোনো বন্ধন বা দুঃখেরও অস্তিত্ব থাকে না।

এই শ্লোকটি বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখ বিষয়ক মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরে। কারণ এখানে দেখানো হয়েছে যে মানুষের কামনা-বাসনাই তার দুঃখের মূল কারণ। বৌদ্ধ দর্শনে অবিদ্যা বা অজ্ঞতাও দুঃখের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মানুষ যখন বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তখন সে নিত্য পরিবর্তনশীল জগতকে স্থায়ী বলে মনে করে এবং সেই ভ্রান্ত ধারণার কারণেই আসক্তি ও দুঃখের সৃষ্টি হয়। দুঃখের এই কারণগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদের মাধ্যমে।[৭] এই দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ হল- অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা মরণ বা দুঃখ।

দুঃখের এই কারণ শৃঙ্খল তাঁদের অনিত্যতা এবং অনাত্মা তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। গৌতম বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন যে জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য বা পরিবর্তনশীল। কোনো বস্তুই চিরস্থায়ী নয় এবং সবকিছুই ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। মানুষ যখন এই পরিবর্তনশীল জগতকে স্থায়ী বলে মনে করে এবং তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তখনই দুঃখের সৃষ্টি হয়। ধম্মপদে এই অনিত্যতার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি"[৮] অর্থাৎ সকল সংস্কার অনিত্য। সমস্ত সংযোজিত বা সৃষ্ট বস্তুই অনিত্য। এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য সৃষ্টি করে এবং তাকে দুঃখের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। একইভাবে অনাত্মার লক্ষণ প্রসঙ্গে ধম্মপদে বলা হয়েছে,

"সব্বে ধম্মা অনত্তাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে, এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।"[৯]

এখানে বলা হয়েছে যে, সকল ধর্মই অনাত্ম, অর্থাৎ কোনো স্থায়ী আত্মা বা সত্তা নেই; এবিষয়ে মানুষের যখন সম্যক জ্ঞান হয়, তখন এই উপলব্ধি মানুষকে আসক্তি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। এই আলোচনা থেকে এটি উপলব্ধ হয় যে জগতের সকল বস্তু যখন অনিত্য বা অস্থায়ী তাহলে দুঃখও অনিত্য। এই যুক্তিবলে গৌতম বুদ্ধ দুঃখ মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের যাত্রা শুরু করেছেন। আর এই যাত্রার মধ্য দিয়ে গৌতম বুদ্ধ মানবমুক্তির একটি সুসংগঠিত ও যুক্তিনিষ্ঠ পথ নির্দেশ করে গেছেন।

বৌদ্ধমতে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ। এই মুক্তিকে নির্বাণ বলা হয়। নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষের সমস্ত কামনা, আসক্তি এবং অজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং এর ফলে সে সংসারচক্র থেকে মুক্তি লাভ করে। নির্বাণকে পরম শান্তির অবস্থা বলা হয়, যেখানে কোনো দুঃখ, শোক বা ভয়ের স্থান নেই। *ধম্মপদ* গ্রন্থে এই নিবার্ণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে— "নত্থি সন্তি পরমংসুখং।"[১০] অর্থাৎ শান্তির চেয়ে বড় সুখ আর কিছু নেই। এখানে শান্তি বলতে নির্বাণের অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত।

এই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়রূপে ধম্মপদের মার্গ বগ্গে বলা হয়েছে— "মগ্গানঙ্গিকো সেট্ঠো"[১১], অর্থাৎ সকল পথের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ। এখানে 'মার্গ' বলতে মূলত দুঃখমুক্তির পথকেই বোঝানো হয়েছে। যে পথ নির্দেশ করেছেন তা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এই পথের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সে ধীরে ধীরে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্ভুক্ত সম্যক দর্শন, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি মানুষের জীবনকে সৎ, শুদ্ধ এবং সংযমপূর্ণ করে তোলে।

এছাড়াও ধম্মপদের বুদ্ধবগ্গের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ গাথায় দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অষ্টাঙ্গিক মার্গকে দুঃখ থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পথ অনুসরণ করলে মানুষ দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "যো চ বুদ্ধং চ ধম্মং চ সঙ্ঘং চ সরণং গতো, চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি।"[১২] অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করে এবং সম্যক্ জ্ঞানের মাধ্যমে চারটি আর্যসত্য— দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধরূপে অষ্টাঙ্গিক মার্গ— উপলব্ধি করে, তার জন্য এই আশ্রয়ই নিরাপদ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই আশ্রয় অবলম্বন করলে সকল দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব।

অতএব উক্ত গাথাগুলির মাধ্যমে দুঃখমুক্তির একটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিত হয়েছে। মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা যার রয়েছে, তাকে চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং জীবনের আচরণে নৈতিক গুণাবলীর চর্চা করতে হবে। এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনই মূলত অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান শিক্ষা।

এই পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে মানুষ তার কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে। এপ্রসঙ্গে ধম্মপদ বলা হয়েছে,

"সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং।"[১৩]

অর্থাৎ সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকা, কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং নিজের মনকে পরিশুদ্ধ রাখা—এই তিনটিই বুদ্ধের শিক্ষা। এই শ্লোকটির মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের নৈতিক আদর্শকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ধম্মপদের শিক্ষায় দুঃখ ও দুঃখমুক্তির ধারণা কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এখানে মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ ও শুদ্ধ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন যে মানুষের মনই তার সুখ ও দুঃখের মূল কারণ, তাই মনকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে *ধম্মপদের* অত্তবগ্গো তে বলা হয়েছে, "অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া"[১৪] অর্থাৎ আত্মাই আত্মার নাথ, অন্য নাথ আর কে আছে? এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায়, মানুষ নিজেই নিজের আশ্রয়; অন্য কেউ তার প্রকৃত আশ্রয় হতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সাধনার মাধ্যমে

ব্যক্তি সেই আশ্রয় লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে মুক্তি লাভের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই নিজ প্রচেষ্টায় সাধনা করতে হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বৌদ্ধ দর্শনে মানবজীবনের দুঃখ কেবল একটি তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে চর্চিত হয় নি; বরং দুঃখ মুক্তির ব্যবহারিক সমাধান এখানে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণী বা উপদেশের মাধ্যমে কোনোরকম তাত্ত্বিক জটিলতায় না গিয়ে খুব সহজ এবং সরলভাবে জীবন রহস্যের জট খোলার প্রয়াস করে গেছেন। কারণ তাঁর জীবন দর্শনের মূলে রয়েছে মানবতাবাদী ভাবনা। গৌতম বুদ্ধের দর্শন প্রকৃত অর্থে মানুষের দর্শন। তাঁর দুঃখ ও দুঃখমুক্তির ধারণা মানবজীবনের এক গভীর বাস্তবতাকে প্রকাশ করে। গৌতম বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন যে সংসারজীবন অনিত্য এবং দুঃখময়। সাধারণ মানুষ লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্তী হয়ে ধীরে ধীরে দুঃখের বন্ধন আবদ্ধ হয়। গৌতম বুদ্ধ সেই দুঃখ থেকে মুক্তির একটি কার্যকর ও ব্যবহারিক পথ নির্দেশ করেছেন। এই পথ মানুষের নৈতিক শুদ্ধি, মানসিক সংযম এবং প্রজ্ঞার বিকাশের মাধ্যমে তাকে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত করে। এই পথ শুধু দুঃখমুক্তির সূচক নয়, করুণা, মৈত্রী, অহিংসার পথে পরিচালিত করে। এই যাত্রাপথ মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, সচেতন এবং আত্মনির্ভর করে তোলে এবং তাকে দুঃখমুক্ত ও প্রজ্ঞাময় জীবনের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। *ধম্মপদের* শ্লোকগুলির মাধ্যমে এই নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষা সহজ অথচ গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এবং মানুষের মন, নৈতিক আচরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের বিখ্যাত উপদেশ "আত্মদীপ ভব" অর্থাৎ "নিজেই নিজের প্রদীপ হও"— বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই উক্তির মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মুক্তির পথ অন্বেষণে মানুষকে নিজস্ব বোধ, বিচারবুদ্ধি ও সাধনার উপর নির্ভর করতে হবে। বাহ্যিক কোনো অলৌকিক শক্তি বা কর্তৃত্ব মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে না; বরং আত্মজাগরণ, আত্মশাসন এবং সম্যক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই দুঃখমুক্তি সম্ভব। তাই বলা যায়, দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের যে পথ গৌতম বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন তা মূলত মানুষের অন্তর্গত শক্তি, প্রজ্ঞা এবং নৈতিক সাধনাকে জাগ্রত করার পথ। যে পথের নির্মাতা মানুষ নিজেই।

তথ্যসূত্র:

[১] গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, সুকোমল চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৮।
[২] জরাবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৭৭।
[৩] যমকবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১।
[৪] পিয়বগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১০৭।
[৫] পিয়বগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১০৮।
[৬] পিয়বগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১০৫।
[৭] ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল থেকে গৃহীত, পৃষ্ঠা ৯১।
[৮] মগ্গবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১৩৪।
[৯] মগ্গবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১৩৫।
[১০] সুখবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১০১।
[১১] মার্গবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ১৩৩।
[১২] বুদ্ধবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৯৬।

[১৩] বুদ্ধবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৯৩।
[১৪] অত্তবগ্গো, ধম্মপদ, ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৮১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *সর্বদর্শন সংগ্রহ* (সায়ন মাধবীয়), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৪০৭), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।
সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৪১৫), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

ইংরেজী গ্রন্থ:

১. Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy. (Vol. I- V). (1969), Cambridge University Press.
২. Raju, P.T. The Philosophical Traditions of India. (2009). Delhi: MLBD Publishers.
৩. Sharma, C.D. A critical survey of Indian philosophy. (2000). Delhi: MLBD Publishers.

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চ্যাটার্জি, অমিতা কর্তৃক (সম্পাদিত)। ভারতীয় ধর্মনীতি। (১৯৬৫)। কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
২. চৌধুরী, সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। (২০২১)। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৩. চৌধুরী, সাধনকমল (সম্পাদিত ও ভাষান্তরিত)। বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়। (১৪১৫)। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।
৪. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী। পালী ত্রিপিটক। (বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটকের সার সংকলন)। (২০১১), কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৫. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। বৌদ্ধধম্ম। (১৯০১)। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৬. তর্কভূষণ, প্রমথনাথ। বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্বাণতত্ত্ব। (১৯৯৯), কলকাতা: উদ্বোধন।
৭. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। (২০০৪)। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।
৮. বসু, চারুচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত। ধম্মপদ। (২০২০)। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।
৯. ভট্টাচার্য, অমিত। বৌদ্ধ দর্শনম্। (২০০৭)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
১০. ভট্টাচার্য্য, অনন্ত কুমার ন্যায়তর্কতীর্থ। বৈভাষিক দর্শন। (২০২২)। কলকাতা: তথাগত।
১১. মণ্ডল, প্রদ্যোত। ভারতীয় দর্শন। (২০২৪)। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
১২. স্বামী বিদ্যারণ্য। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম। (১৯৯৯)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক।
১৩. সেন, রণব্রত। ধম্মপদ (১৯৭৪)। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী।
১৪. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়। (২০১৩)। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।